অসুখ-বিসুখ

৪২

এই সংখ্যায় —

- গর্ভাবস্থায় উচ্চ রক্তচাপ ও খিঁচুনি ঃ একটা মারাত্মক জটিলতা।
- পরমাণু বিদ্যুৎ কেন নয়?
- ভেজাল ও নকল ওষুধ চিনবেন কী করে?
- ব্যথার ওষুধে কিডনি নষ্ট।
- ভুলে ভরা বই।

(এই পত্রিকায় কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না)

৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মার্চ - এপ্রিল ২০০৭

REGISTERED WITH REGISTRAR OF NEWS PAPERS FOR INDIA (RNI) UNDER NO. WBBEN/2001/7072

সূচীপত্র

১৬১ চিকিৎসা মানে কী স্বাস্থ্য? (সম্পাদকীয়)

১৬৩ পরমাণু বিদ্যুতের বিপদ

১৬৭ গর্ভাবস্থায় উচ্চ রক্তচাপ - এক জটিল এবং ভয়াবহ সমস্যা

১৭৪ ওষুধের ঠ্যালায় কিডনি যে যায়

১৭৭ ভেজাল ও নকল ওষুধ

১৮৩ অসুখ-চিকিৎসা শ্বাসতন্ত্র (১)

১৮৮ আপনাদের প্রশ্ন-আমাদের উত্তর

১৯১ পাঁচ মিশেলি

ফাউণ্ডেশান ফর হেলথ অ্যাকশানের কয়েকটি প্রচেষ্টা ঃ

- বোধির (ইংরেজী ভাষায়, মূলত চিকিৎসকদের জন্য) প্রকাশ ঃ

  Bulletin On Drug & Health Information (BODHI), a bimonthly, primarily for medical practitioners

- স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা সভা এবং কর্মশালার আয়োজন করা
- স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে বইপত্র প্রকাশ করা
- ওষুধ ও চিকিৎসা বিষয়ে নিরপেক্ষ এবং প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করা

ফাউন্ডেশান ফর হেলথ্ অ্যাকশনের (একটি মুনাফাবিহীন, জনকল্যাণমুখী ট্রাষ্ট) লক্ষ্য ঃ

- অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা এবং ক্ষতিকারক ও ফালতু ওষুধের বিলোপ এবং যুক্তিপূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতি এবং ওষুধের প্রসার।
- বিভিন্ন সংগঠন এবং গোষ্ঠীর সাথে সম্মিলিত ভাবে বঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার অর্জনের জন্য আন্দোলনে সামিল হওয়া।
- চিকিৎসা-ক্রেতা সচেতনতা বৃদ্ধি এবং চিকিৎসকদের প্রকৃত তথ্য জানার অধিকারের দাবিকে জোরদার করা।

৭ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা (মার্চ - এপ্রিল ২০০৭) পত্রিকার দাম ঃ দশ টাকা

পরমাণু বিদ্যুতের বিপদ

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

প্রথমে পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের কথা হয়েছিলো সুন্দরবনে। সুন্দরবনের বাসিন্দা, বিজ্ঞানকর্মী, পরিবেশবাদীদের বিরোধিতায় সুন্দরবনে পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপিত হয় নি। রাজ্যের সরকার এবার পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য স্থান বাছাই করেছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হরিপুরে। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অসংখ্য মানুষ বাস্তুচ্যুত হবেন, জীবিকা হারাবেন.....।

এছাড়াও মারাত্মক বিপদ হবে বিকিরণ থেকে। এই লেখায় পরমাণু বিদ্যুৎ কিভাবে তৈরি হয়, বিকিরণের মানে কি ও তা কত রকমের, বিকিরণ থেকে মানুষের কি ক্ষতি হয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

- মৌলিক পদার্থ যেমন লোহা, তামা ইত্যাদিকে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সবথেকে ছোটো কণায় (যাতে মৌলিক পদার্থের সব গুণগুলো থাকে) পৌঁছালে তখন পদার্থের ওই কণাকে পরমাণু বলে।
- পরমাণুর ভর তার সমগ্র আয়তনের তুলনায় খুব ছোটো এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত, যাকে পরমাণুর নিউক্লিয়াস বলে। (পরমাণুর আকার বুঝতে জীবকোষের কথা ভাবা যেতে পারে। জীবকোষের যেমন কোষপর্দা থাকে আর ভেতরে থাকে নিউক্লিয়াস তেমনি পরমাণুর কেন্দ্রেও থাকে নিউক্লিয়াস যাকে ঘিরে থাকে এক বা তার বেশি খোলস। নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন আর নিউট্রন। পরমাণুর খোলসে থাকে ইলেকট্রন।)
- ঋণাত্মক আধানগ্রস্ত ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে ঘিরে বৃত্তাকার বা অর্ধবৃত্তাকার কক্ষপথে তীব্রগতিতে ঘুরতে থাকে।
- নিউক্লিয়াসে থাকা প্রোটন ধনাত্মক আধান বহন করে ও খোলসে থাকা ইলেক্ট্রন ঋণাত্মক আধান বহন করে। প্রোটনের মোট সংখ্যা ইলেক্ট্রনের মোট সংখ্যার সমান হয় তাই পরমাণু চারিত্রিক ভাবে প্রশমিত থাকে।
- যে সব পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটনের সংখ্যা সমান অথচ নিউট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন, তারা পরস্পরের আইসোটোপ। যেমন—সাধারণ হাইড্রোজেন, ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়ামের নিউক্লিয়াসে প্রোটনের সংখ্যা ১, কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা ০,১ ও ২। সাধারণ হাইড্রোজেন, ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম পরস্পরের আইসোটোপ।

পারমাণবিক শক্তি ব্যাপারটা কি?

পরমাণুর নিউক্লিয়াসের গঠনের পরিবর্তন করাকে বলা হয় নিউক্লিয় বিক্রিয়া (nuclear reaction)। নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাকে বলে নিউক্লিয় শক্তি (nuclear energy) বা পারমাণবিক শক্তি (atomic energy)।

পারমাণবিক শক্তি প্রাকৃতিক ভাবে উৎপন্ন হতে পারে। সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রগুলো যে তাপ ও আলো দেয় তার কারণ সেখানে ক্রমাগত ঘটে চলা নিউক্লিয় বিক্রিয়া। আবার মানুষও পারমাণবিক শক্তি তৈরি করতে পারে—পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিউক্লিয় বিক্রিয়ক (nuclear reactor) যন্ত্রের সাহায্যে। নিউক্লিয় বিক্রিয়া ঘটিয়েই পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

দু'ভাবে নিউক্লিয় শক্তি উৎপাদন করা যায় —

১। বড়ো পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে ভেঙ্গে ও

২। ছোটো পরমাণুর নিউক্লিয়াসগুলোকে জুড়ে।

➢ নিউক্লিয় ফিশন (nuclear fission) — এখানে পরমাণুর নিউক্লিয়াসগুলোকে ভেঙ্গে শক্তি উৎপাদন করা হয়। পরমাণু বোমার শক্তিও নির্ভর করে এই নিউক্লিয় বিক্রিয়ার ওপর। ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াসকে প্রথমে একটা নিউ ট্রন দিয়ে আঘাত করলে তা সহজেই ভেঙ্গে যায়। নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে অনেকগুলো নিউট্রন বার হয়, যারা আবার অন্য ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে আঘাত হানতে থাকে। অনবরত চলতে থাকা এই ঘটনাকে বলে "শৃঙ্খল বিক্রিয়া" (chain reaction)।

➢ নিউক্লিয় ফিউশন (nuclear fussion) — এক্ষেত্রে পরমাণুর নিউক্লিয়াসগুলোকে একের পর এক যুক্ত করা হয়। খুব উচ্চ তাপমাত্রাতেই এটা হতে পারে। সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রগুলো তাপ ও আলো উৎপাদন করে চলেছে নিউক্লিয় ফিউশন বিক্রিয়ায়। মানব সভ্যতার (? অসভ্যতার) সবচেয়ে শক্তিশালী ও ধ্বংসাত্মক অস্ত্র হাইড্রোজেন বোমাও কাজ করে এইভাবে। নিউক্লিয়াস ফিউশন শুরু করতে এতটাই তাপ দরকার যে তার জন্য পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ করতে হয়। সেই তাপে হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসগুলো জুড়ে হিলিয়াম তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর শক্তি উৎপন্ন করে, বৃহত্তর বিস্ফোরণ ঘটায়।

পরমাণু বিদ্যুৎ তৈরি হয় কি ভাবে?

নিউক্লিয় ফিশনে যে তাপ উৎপন্ন হয় সেই তাপ জলকে গরম করে বাষ্প তৈরি করে। বাষ্প টার্বাইনকে ঘোরায়। টার্বাইন আবার জেনারেটরকে ঘুরিয়ে উৎপাদন করে বিদ্যুৎ।

নানা ধরনের বিকিরণ ঃ

আগেই বলা হয়েছে যে পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসে থাকা প্রোটন ধনাত্মক, কিন্তু নিউট্রন না ধনাত্মক, না ঋণাত্মক অর্থাৎ নিরপেক্ষ। নিউক্লিয়াসে একাধিক প্রোটন থাকলে তাদের ধনাত্মক চার্জ একে অপরকে ঠেলে বের করে দিতে চেষ্টা করে কিন্তু নিউট্রন তার নিউক্লিয় শক্তির মাধ্যমে এই কাজে বাধা দেয়। কোনো কারণে এই নিউক্লিয় শক্তি বিঘ্নিত হলে (যেমন নিউক্লিয়াসে প্রোটনের সংখ্যা বেড়ে গেলে বা বেশি থাকলে কিংবা নিউট্রনের সংখ্যা কম থাকলে) নিউক্লিয় শক্তি কমজোরি হয়ে পড়ে। একই পরমাণুর প্রোটন বা নিউট্রনের সঠিক সংখ্যায় বা কমবেশি থাকা অবস্থাকে বলা পরমাণুর আইসোটোপ। সঠিক সংখ্যায় থাকলে নিউক্লিয় শক্তি তার কাজ ঠিক মতো করতে পারে। পরমাণুর এই অবস্থাকে বলা হয় স্থায়ী আইসোটোপ (stable isotope) কিন্তু প্রোটন বা নিউট্রনের সঠিক সংখ্যার কমবেশি থাকা অবস্থাকে বলা পরমাণুর অস্থায়ী (unstable isotope) অথবা রেডিওঅ্যাক্টিভ কিংবা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ (Radioactive isotope) যেমন ইউরেনিয়াম ২৩৫ হলো স্থায়ী আর ইউরেনিয়াম ২৩৮ হলো অস্থায়ী আইসোটোপ। পরমাণুর ধর্ম হলো অস্থায়ী থেকে স্থায়ী আইসোটোপ অবস্থায় চলে আসা। অবস্থার এই পরিবর্তনের সময় পরমাণুটার কেন্দ্র থেকে আলফা রশ্মি (alpha rays), বিটা রশ্মি (beta rays), গামা রশ্মি (gamma rays) বের হয় বা বিকিরণ (emission) হয়। এই বিকিরণ মানুষের দেহে বিভিন্ন মাত্রায় তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে।

আলফা রশ্মি ঃ এ এক ধরনের 'কণাতরঙ্গ'। রেডিয়াম (radium), প্লুটোনিয়াম (plutonium), ইউরেনিয়াম (uranium), রেডন (radon)-এর অস্থায়ী বা তেজস্ক্রিয় পরমাণুর (কেন্দ্রের) অবস্থার পরিবর্তনের ফলে আলফা রশ্মি উৎপন্ন হয়। এর ভর বেশি হওয়ার জন্য আলফা রশ্মি সাধারণত খুব অল্প দূরত্ব যেতে পারে এবং এদের ভেদ করার ক্ষমতাও কম। একটা কাগজ দিয়ে আলফা রশ্মিকে আটকে দেওয়া যায়। তাই আলফা রশ্মি বিকিরণ

করছে এমন পদার্থকে খেলেই কেবল মাত্র স্বাস্থ্যের ওপর আলফা রশ্মির প্রভাব পড়ে।

বিটা রশ্মি ঃ বিটা রশ্মি এক কণাতরঙ্গ যাতে দ্রুতগামী ইলেকট্রন থাকে। শক্তির (বেগের) ওপর নির্ভর করে জলের মধ্যে দিয়ে বিটা-রশ্মি যায় — ট্রিটিয়াম এর ক্ষেত্রে ১ মি.মি.-রও কম, ফসফরাস-৩২ এর ক্ষেত্রে যায় প্রায় ১ সেমি। আল্‌ফা রশ্মির মত বিটা রশ্মির ক্ষেত্রেও স্বাস্থ্যের বিপদ বিটা রশ্মি উৎপাদনকারী কোনো পদার্থ খাওয়ার পর।

গামা রশ্মি ঃ হলো এক তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। সূর্যের আলোয় বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তড়িৎ চুম্বকীয় রশ্মির মিশ্রণ থাকে, তার মধ্যে দীর্ঘতম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অবলোহিত (infra red)-এর, তারপর কমতে থাকে - লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, আকাশি, নীল, বেগুণি। সবচেয়ে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অতিবেগুণি রশ্মির। গামা রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অতিবেগুণি রশ্মির চেয়েও অনেক কম, ফলে শক্তি অনেক বেশি। কোবাল্ট-৬০ এবং সিজিয়াম-১৩৭-এর মত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের কেন্দ্রের স্বতস্ফূর্ত অবস্থা পরিবর্তনের সময় গামা রশ্মি উৎপন্ন হয়। কোবাল্ট-৬০ থেকে উৎপন্ন গামারশ্মি মানব শরীরের গভীরে ঢুকতে পারে তাই ক্যান্সারের রেডিও থেরাপি চিকিৎসাতে এর ব্যবহার হয়।

নিউট্রন ঃ ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামের নিউক্লিয় ফিশনে নিউট্রন যুক্ত হয়। নিউট্রনের তড়িতাধান না থাকায় তারা নিজেরা কোষের ক্ষতি করে না। কিন্তু মানব শরীরে প্রচুর পরিমাণ হাইড্রোজেন থাকে (মানব শরীরের ৭০ ভাগ হলো জল আর জলের একটা অণুতে থাকে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু)। নিউট্রন যখন হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস অর্থাৎ প্রোটনকে আঘাত করে তখন ওই প্রোটন শরীরে আয়নন (ionisation) ঘটিয়ে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি করে। নিউট্রন গামা রশ্মির থেকে অনেক বেশি ক্ষতি করতে পারে।

বিকিরণ কি ভাবে কোষকে প্রভাবিত করে?

অতিবেগুণি রশ্মি কোষের ক্ষতি করে, যার উদাহরণ Sun burn বা চামড়া রোদে পোড়া। আগে যে রশ্মিগুলোর কথা বলা হলো তারাও ক্ষতি করে, তবে অন্যভাবে। অতি বেগুণি রশ্মি পরমাণুকে উত্তেজিত করে (excitation) আর অন্যগুলো করে আয়নন (ionisation)। উত্তেজনার অর্থ ইলেক্ট্রনের শক্তিস্তরে পরিবর্তন। গামা রশ্মি বিটা রশ্মির চেয়ে আলাদাভাবে কাজ করে।

বিকিরণ কোষের উপাদান অণুগুলোর ওপর প্রত্যক্ষ ভাবে বা জলের অণুর ওপর পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলতে পারে। কোষে প্রধান প্রভাব হলো ডি.এন.এ (DNA)-র ভাঙ্গন। ডি.এন.এ.-তে একজোড়া সম্পূরক ফিতের আকারে (strands) রাসায়নিক সাজানো থাকে। বিকিরণের ফলে একটা ফিতে বা দুটো ফিতেই ভাঙতে পারে। একটা ফিতে ভাঙলে অটুট ফিতের ছাঁচে ভাঙা আবার জুড়ে যেতে পারে। দুটো ফিতে ভাঙলে ওই ক্ষতি পূরণ হওয়া কঠিন, ভাঙা প্রান্তগুলো ভুলভাবে জুড়তে পারে, কোনো ভাঙা খন্ড হারিয়ে যেতে পারে। এর ফল হলো জিনের পরিব্যক্তি (mutation), ক্রোমোজোম অ্যাবারেশন (chromosoml aberration) বা কোষের মৃত্যু।

মানবশরীরে বিকিরণের প্রভাব ঃ

⇔ **চুল** - বেশি বিকিরণ লাগলে খুব তাড়াতাড়ি গোছা গোছা চুল ওঠে।

⇔ **মস্তিষ্ক** - স্নায়ুকোষ বিভাজিত হয় না বলে কম বিকিরণে প্রত্যক্ষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু বেশি বিকিরণ লাগলে স্নায়ু কোষ ও ছোটো রক্তনালিগুলো ধ্বংস হয়ে মৃগীর মতো খিঁচুনি ও সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হতে পারে।

⇔ **থাইরয়েড গ্ল্যান্ড** - তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের প্রভাবে

থাইরয়েড অংশত বা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

⇔ **রক্ত** - বিকিরণের ফলে রক্তের লিম্ফোসাইট কোষের সংখ্যা কমতে থাকে, ফলে ব্যক্তির জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়তে থাকে। এই ধরনের অসুস্থতার প্রারম্ভিক উপসর্গ লক্ষন ইনফ্লুয়েঞ্জার মত। রক্তপরীক্ষা না করলে বোঝা যায় না। হিরোসিমা নাগাসাকির (জাপানের এই শহর দুটোতে আমেরিকা কয়েক লক্ষ মানুষকে মেরে ফেরেছিলো আর অসংখ্য মানুষ পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলো) তথ্য থেকে জানা যায় ১০ বছর পর অবধিও উপসর্গগুলো থাকে। লিউকোমিয়া ও লিম্ফোমার ঝুঁকি বাড়ে।

⇔ **হৃদপিণ্ড** : বেশি বিকিরণ বা এক্সপোজারে ছোট রক্তনালিগুলো সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে হৃদপিণ্ডের বিকলতা (heart failure) ও মৃত্যু ঘটাতে পারে।

⇔ **খাদ্যনালি** - খাদ্যনালির আবরক ঝিল্লিতে বিকিরণ জনিত ক্ষতিতে বমিভাব, রক্তবমি ও পাতলা পায়খানা হয়।

⇔ **জননতন্ত্র** - জননতন্ত্রের কোষগুলো দ্রুত বিভাজিত হতে থাকে। তাই কম মাত্রাতেও ক্ষতি হতে পারে। বিকিরণে প্রভাবিত অনেকেই সন্তান উৎপাদন অক্ষম হয়ে যান।

বিকিরণ ও বংশগতি : প্রত্যেক শিশুর অর্ধেক জিন আসে বাবার থেকে, বাকি অর্ধেক মা'র থেকে। প্রত্যেকটা জিন এককভাবে একটা ডি.এন.এ. অণুর অংশ বিশেষ। আকারে এরা খুব বড়ো, সুশৃঙ্খল ভাবে সাজানো হাজার হাজার পরমাণু দিয়ে তৈরি। অনেকগুলো জিন একসাথে মিলে তৈরি করে ক্রোমোজোম। মানুষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা ৪৬।

বিকিরণ কি ভাবে ডি. এন. এ অণুর ক্ষতি করে তা আগে বলা হয়েছে। পরিব্যক্ত জিন বংশ থেকে বংশান্তরে প্রভাবিত হয় এবং পরবর্তী প্রজন্মগুলোর নানা রোগের কারণ হয়, বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নেয়।

তেজস্ক্রিয়তার কোনও নিরাপদ মাত্রা হয় না

আগে ভাবা হতো নির্দিষ্ট মাত্রার নিচে তেজস্ক্রিয়তা থেকে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না। পরে স্থির করা হয় তেজস্ক্রিয় বিকিরণের গ্রহণযোগ্য মাত্রা বছরে ৭৩ রেম। তেজস্ক্রিয়তার ফলাফল স্পষ্ট হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে এই মাত্রা কমানো হতে থাকে। ১৯৩৬ সালে বছরে ৫০ রেম, ১৯৮৪ সালে বছরে ২৫ রেম, ১৯৯৫ সালে বছরে ১৫ রেম। বিকিরণ জনিত সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক কমিশন ১৯৫৮ সালে গ্রহণযোগ্য মাত্রা স্থির করে পরমাণু শিল্পে কর্মরতদের জন্য বছরে ৫ রেম এবং সাধারণ মানুষের জন্য ০.৫ রেম। দেখা গেছে বছরে ৫ রেম মাত্রার তেজস্ক্রিয়তাতে প্রতি ২ হাজারে ১ জনের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা। ১৯৯০ সালে আন্তর্জাতিক কমিশন সুপারিশ করে পরমাণু শিল্পের কর্মীদের জন্য তেজস্ক্রিয় বিকিরণের গ্রহণ যোগ্য মাত্রা বছরে ২ রেম এবং সাধারণ মানুষের জন্য ০.১ রেম করা হোক সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে তেজস্ক্রিয়তার কোন নিরাপদ মাত্রা নেই।

বিপদ কেবল পরমাণু বিদ্যুৎ শিল্পের কর্মীদের নয়।

পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা তো প্রত্যক্ষ ভাবে বিকিরণের শিকার হন। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুর্ঘটনা ঘটলে কি হয় তা দেখা গেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের চেরনোবিলের দুর্ঘটনায়। তাছাড়াও পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের থেকে অনেকদূর অবধি মানুষ বিকিরণের শিকার হন পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্য পদার্থ ইত্যাদি থেকে। তথাকথিত পরমাণু বোমা বা হাইড্রোজেন বোমা থেকে কোন অংশে কম নয় পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রভাব।

তাই আওয়াজ তুলুন — পারমাণবিক বোমা যেমন চাই না, তেমনি চাই না পারমাণবিক বিদ্যুৎ। সূর্যের আলো বা বাতাস থেকে যে শক্তি বা বিদ্যুৎ পাওয়া যায় তা হলো নিরাপদ। অজানা কারণে এরজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয় না। গবেষনার জন্য যতটা দরকার ততটা পয়সা ঢালা হয় না।